Rs. 2.00

PRABINBARTA

প্রবীণবার্তা

MONTHLY

মূল্য ঃ ২ টাকা

মাসিক

Vol : XIII Issue : XII, 15th, March, 2024 ১লা চৈত্র, ১৪৩০, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

১৯তম বার্ষিক সংখ্যা

সম্পাদকীয়

১৯০৫ সালে আমাদের প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়। অর্থাৎ এই মার্চ মাসে আমরা এক উনিশ বছরের নব্য তরুণ। কিশোর কবি সুকান্ত চেয়েছিলেন এদেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে। কবির মনে হয়েছিল আঠারো বছর বয়সটা স্পর্ধার বয়স, অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে লড়াইতে নামার বয়স, ভয়হীনতার বয়স। কিন্তু প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির মধ্যে অবশ্যই ফারাক আছে। এই প্রতিষ্ঠান হিসাবে আমরা হয়তো সেই সাহস বা স্পর্ধা দেখাতে পারেনি। কিন্তু গর্বিত হওয়ার মতো বেশ কিছু ক্ষেত্র আমরা প্রস্তুত করতে পেরেছি। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা প্রতিষ্ঠাতাদের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছি।

প্রথমে আমাদের ব্যর্থতার ক্ষেত্রগুলো স্বীকার করে নেওয়া ভালো। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রয়াত বিমল চ্যাটার্জির স্বপ্ন ছিল, বেথুন ইনস্টিটিউটে হবে জেরিয়াট্রিক সমস্যা (শারীরিক ও মানসিক উভয়ই) নিয়ে নিরন্তন গবেষণা। সে স্বপ্ন অবশ্যই পূরণ হয়নি। সরকারি সাহায্য ছাড়া এই ধরনের গবেষণা চালাবার জন্য যে পরিমাণ অর্থবল এবং লোকবলের প্রয়োজন হয় তা আমরা কখনই জোগাড় করে উঠতে পারিনি। প্রতিষ্ঠাতাদের আরও ইচ্ছা ছিল আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে আমরা নানারকম সমীক্ষা চালাব। সেটাও সম্ভব হয়নি।

কিন্তু বিমল চ্যাটার্জি বা হরিদাস মালাকারদের আদর্শ থেকে আমরা বিচ্যুত হইনি। গত ১৯ বছরে আমরা আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের নিয়ে প্রভূত কাজ করতে পেরেছি। এই মুহূর্তে আকুপাংচার, ফিজিওথেরাপি সহ চিকিৎসা কেন্দ্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। আকুপাংচার এসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার সহযোগিতায় আকুপাংচার চিকিৎসার ক্ষেত্রে এতদ্দঞ্চলে আমরা সাড়া জাগাতে পেরেছি। আমাদের মুখপত্র প্রবীণ বার্তা-র প্রকাশ অবিচ্ছিন্ন রাখতে পেরেছি, এমনকি করোনা অতিমারীও তার প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। আমাদের পরিবেশিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো প্রবীণ মানুষদের একাকীত্ব দূর করতে প্রভূত সাহায্য করে চলেছে। সর্বোপরি কোনো সরকার বা কর্পোরেট সংস্থার ধামাধরা না হয়েও আমরা আমাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পেরেছি। আশা করি ভবিষ্যতেও পারব।

Vol : XIII Issue : XII, 15th, March, 2024, PRABINBARTA Postal Regd. NO.-KOL RMS/449/2022-24

—সূচিপত্র—

সম্পাদকীয় ১

ডা. নর্মান বেথুন আমাদের প্রেরণা— ডা. মৃগেন গাঁতাইত ৩

ত্যাগ— ডা. গোবিন্দ মাইতি ৪

ঘাড়ের ব্যথা ও মাথাঘোরা কমাতে আকুপাংচার— ডা. সন্দীপ সেনগুপ্ত ৫

বিজ্ঞানই পথ দেখায়— তপন কুমার দাস ৮

ঃ কবিতাগুচ্ছ ঃ

শরৎ বোস লেনের রোজনামচা— বীথি কর ৯

মুক্তি— খগেশ্বর দাস ১০

কবিতা শেষ, পড়ো— ভবানীশংকর চক্রবর্তী ১০

আকাশকুসুম— প্রদীপ চক্রবর্তী ১০

কবিতার পথে— ঋুমা সরকার ১১

একদিন— আশিস সান্যাল ১১

অপরাহত মানুষ— অমল কর ১২

আমার ভাষা আমার জননী— মৃণাল দত্ত ১২

অনন্ত— সন্দীপ জানা ১৩

বাচালনামা— গাজী মহম্মদ আবুবকর ১৩

শৈবতীর্থ রুদ্রনাথের গুহা মন্দিরে একটি রাত— সমীর কুমার ঘোষ ১৫

একটি কপোল-কল্পিত সংলাপ— বসু রায়চৌধুরী ১৮

বেথুন ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন— গৌতম রায়চৌধুরী ১৯

২৩ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত পিকনিক— স্নেহাংশু চাকদার ২০

জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় সদা জাগ্রত

পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)

২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭

দূরাভাষ ঃ ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪

যাদবপুর কেন্দ্র

বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন

৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২

বাস স্টপ ঃ অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে

দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সকাল ৮-১১টা/সন্ধ্যা ৬-৮টা)

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মণ্ডলী ঃ কবে, কখন

পরামর্শ ১০০টাকা + পি.আর.সি. সহায়তা ১০টাকা (প্রতিবার)

১) ডঃ উৎপল ব্যানার্জী - এম.এস. (অর্থোপেডিক) ২য় ও ৪র্থ সোমবার সন্ধে ৬টা

২) ডঃ মৌমিতা চাটার্জী - এম. ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন) - মঙ্গলবার সন্ধে ৬টা

৩) ডঃ কে. মজুমদার - এম.ডি (জেনারেল মেডিসিন) বিকেল ৫টা

৪) ডঃ সুদীপ্ত গুপ্ত - ডি.জি.ও (গাইনোকলজিস্ট) সন্ধে ৭টা

৫) ডঃ সৌম্য চ্যাটার্জি - এম.ডি. (নিউরো- সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) শুক্রবার সন্ধে ৮টা

৬) শ্রীমতী ছন্দলীনা মহাপাত্র (মেন্টাল কাউন্সিলিং) শুক্রবার সন্ধে ৭টা

৭) শ্রীমতী অঞ্জলী দাস (ফিজিওথেরাপিস্ট) সোম, বৃহঃ, শনি, সন্ধে ৬.৩০

নির্দিষ্ট সময়ের ৩০ মিনিট আগে নাম লেখাতে হবে

কম খরচে সমস্ত রকম প্যাথোলজি

সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮-১১টা, বিকাল ৭-৮টা

যোগাযোগ ঃ ২৪২৫-৪৪৫৪

ডা. নর্মান বেথুন আমাদের প্রেরণা

ডা. মৃগেন গাঁতাইত

মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা অর্থাৎ মানবতাবাদ চিরকালীন। সব দেশে সব কালে মানবতাবাদী মানুষ ছিল এবং আছে। তারই মধ্যে কিছু মানুষের জীবন অন্যদেরকে আকৃষ্ট করে এবং অনুপ্রাণিত করে, বিশেষতঃ যখন শোষিত অত্যাচারিত মানুষের কল্যাণে সেই জীবনের কার্যধারা অতিবাহিত হয়। স্পেনে ফ্যাসিবাদের অত্যাচারে জর্জরিত জনগণকে সাহায্য করতে অনেক বিদেশীদের মধ্যে ভারতের ডা. অটল, কানাডার ডা. নর্মান বেথুন গিয়েছিলেন। পরে বেথুন চিনে গিয়েছিলেন সংগ্রামী চিনা জনগণকে সাহায্য করতে। সেখানেই কর্মরত অবস্থায় বেথুনের মৃত্যু হয় ১৯৩৯ সালের ১২ নভেম্বর। অন্য মানুষকে সাহায্য করতে নিজের প্রাণ দেওয়ার ঘটনা আমাদের নাড়িয়ে দেয়, আবার অনুপ্রাণিত করে।

সাম্প্রতিক ইতিহাসে ভারতের পাঁচজন ডাক্তার (ডা. মদনমোহনলাল অটল, ডা. মোরেশ্বর রামচন্দ্র চোলকার, ডা. দ্বারকানাথ কোর্টনিস, ডা. বিজয় কুমার বসু এবং ডা. দেবেশ মুখোপাধ্যায়) জাপানী সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণে বিধ্বস্ত চিনা জনগণকে সাহায্য করতে চিনে গিয়েছিলেন ১৯৩৮ সালে। বিদেশি আরো কিছু মানুষ চিনের সংগ্রামে সাহায্য করতে গিয়েছিলেন। এখানে ডাঃ কোর্টনিস ১৯৪২ সালের ৯ ডিসেম্বর চিনের মাটিত মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

সাধারণ মানুষের মধ্যে সব সময়েই সদগুণের অস্তিত্ব আছে। সেই গুণকে আরো বিকশিত করে তোলে উন্নত জীবনের চর্চা। মাটিতে জল থাকলেও যেমন গাছে জল দিয়ে পরিচর্যা করতে হয়, তেমনি সৎ জীবনের চর্চা মনকে বিকশিত করে।

মানুষের অসুস্থতার মূল কারণ যে সমাজব্যবস্থার মধ্যে নিহিত আছে তা উপলব্ধি করে তাকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেন ডা. বেথুন। মানুষের শরীরের চিকিৎসাক হিসাবে তিনি জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সমাজব্যবস্থার ব্যাধির মূল দিকটি সম্বন্ধে মানুষকে অবহিত করে গেছেন। তাই বেথুনের জীবন এবং কাজ নিয়ে আমাদের চর্চা চালিয়ে যেতেই হবে। কারণ, সমাজব্যবস্থার মধ্যে ধনবাদী অর্থলোলুপতা বা সাম্রাজ্যবাদী শোষণ অত্যাচারের ধারা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। বারবার ঘষলে যেমন অস্ত্রের ধার বাড়ে, তেমনি বারংবার সৎ চিন্তা আলোচনার মাধ্যমে মনের বিকাশ হয়।

বেথুনের জীবনে থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের করণীয় কাজগুলো হওয়া উচিত :

ক) নিজের স্বার্থের বাইরে সমাজের জন্য কিছু কাজ করব। কারণ সমাজ আমাদের লালন করে।

খ) মানুষের উপর শাসক শোষকদের অত্যাচার হলে তার বিরোধিতা করা। কারণ, ওই অত্যাচার আমাদের নিজের উপরেই ভবিষ্যতে আসতে পারে।

গ) যে কোনো ঘটনাকে সমাজমুখী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখা।

ঘ) মানুষের লোভ, মুনাফা লাভের আকাঙ্ক্ষা সর্বগ্রাসী। শাসকদের লোভই সামাজের দুর্দশার কারণ।

ঙ) ছোট ছোট কাজগুলোকেও গুরুত্ব দিয়ে করা উচিৎ, যাতে বড় কাজগুলো ভালোভাবে সম্পন্ন করা যায়।

ত্যাগ

ড. গোবিন্দ মাইতি

ত্যাগ বলতে আমরা ভাবি সংসার ত্যাগ করে হিমালয়ের কোনো গুহায় গিয়ে ঈশ্বরের সাধনা করা। গীতায়ও বলা হয়েছে সর্ব কর্মফল ত্যাগ করতে পারলে ঈশ্বরের কৃপা লাভ করা যায়।

তবে সংসার ত্যাগ না করেও আমরা যদি জীবনে কিছু কিছু গুণ ত্যাগ করি, তাহলে জীবন অনেক সুখের ও সুন্দর হবে। আমাদের জীবনে পরম শত্রু, কাম, ক্রোধ ও লোভ, এছাড়া ঈর্ষা, বিদ্বেষ, মোহ, মাৎসর্য্য, অহংকার মানুষের জীবনে নানা বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মানসিক শান্তি নষ্ট করে।

প্রথমে আসি ঈর্ষার কথায়। আমরা যদি নিজেকে নিয়ে খুশি থাকি তাহলে এই ঈর্ষা ভাবটা চলে যাবে। নিজের যেটুকু আছে সেটাকেই যথেষ্ট বলে ভাবার চেষ্টা করতে হবে। সব অবস্থাতেই নির্বিকার ও আসক্তি শূন্য থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত:, মানুষের অনেক কিছু থাকলে অহংকার বোধ এসে এসে যায়। আমরা সাধারণ মানুষ, সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত। তাই মনের মধ্যে অহংকার বোধ না থাকাই শ্রেয়। নিজের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান না থাকা, কায়মনোবাক্যে সরলতা, আত্মসংযম মানুষের মহৎ গুণ। অহংকার মানুষের পরম বিপর্যয় ডেকে আনে। তাই সদা সংসযতভাব, সর্বভূতে প্রেমভাবাপন্ন, সমাহিত চিত্ত অবলম্বন করতে পারলেই জীবন অনেক সহজ হয়ে যাবে। অহংকার ও দর্প মন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। বিনয় মানুষের একটি পবিত্র গুণ। সবাইকে ভক্তি শ্রদ্ধা করতে ও ভালোবাসতে পারলে, মন থেকে অহংকার দূর হয়ে যবে। মমত্বশূন্য, প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তি, জীবনে অনেক বেশি সুখী।

লোভ মানুষের পরম শত্রু। লোভ সম্বরণ করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। লোভই মানুষকে অসৎ পথে চালিত করে। সাধারণ শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য বিশেষ কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। আসলে আমরা রাজসিক জীবন-যাপনে প্রলুব্ধ হই। চাহিদা বাড়লে তখন লোভ অনেকটাই বেড়ে যায়। কিন্তু আমরা যদি রাজসিক জীবন ছেড়ে সাত্ত্বিক জীবনযাপনে ব্রতী হই তখন লোভ ধীরে ধীরে চলে যাবে। তখন মনের মধ্যে প্রশান্তি বিরাজ করবে। বেশি লোভ মানুষকে বড় বিপদের দিকে ঠেলে দেয়। লোভ বর্জন করতে পারলে সুস্থ শরীরে দীর্ঘ জীবন লাভ করা যেতে পারে। লোভ স্বাস্থ্যের পক্ষেও ক্ষতিকারক।

ক্রোধ মানুষের পরম শত্রু। ক্রোধ মানুষের মনকে উত্তেজিত করে। উত্তেজনার জন্য মন সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। তখন মানুষ অসৎ কর্মের পথে ধাবিত হয়। জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। ক্রোধ লিভারের ক্ষতি করে। মানসিক উত্তেজনা হার্ট ও ব্রেনের ক্ষতি করে। তাই সাত্ত্বিক ধৃতির দ্বারা অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয় সংযম করে, কায়মনোবাক্যে সংযমী, রাগ, দ্বেষ সর্বতোভাবে বর্জন করার প্রয়াসী হতে হবে। কাম, ক্রোধ, লোভ মনের পরম শত্রু। সবকটিই মনকে চঞ্চল করে, বিপথগামী করে। তখন মনের নির্দেশে ইন্দ্রিয়গুলি অসৎ কর্মে লিপ্ত হয়। চঞ্চল মনের মধ্যে তামসিক গুণের প্রাধান্য বিস্তার হয়। মন ক্ষিপ্ত হলে মানুষ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

আমাদের মন হল কামনা-বাসনায় ভরা। তাই সব সময় প্রচুর অর্থ, যশ, মান, সুখ ও ঐশ্বর্যের কামনা করি। এটা জীবনের সঠিক পথ নয়। কেননা কামনা বাসনার কোনো শেষ নেই, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভোগবাদ আমাদের কামনা বাসনাকে বৃদ্ধি করতে থাকে। আমরা প্রায় সবাই অভাব অভিযোগে জর্জরিত। জীবন কষ্টকর। তবুও এই কঠোর পরিস্থিতিতে মনকে ধীর স্থির রাখতে হবে। কামনা বাসনাকে কখনও বৃদ্ধি হতে দেওয়া যাবে না। সমস্ত কামনা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে সহজ সরল জীবনযাপনই শ্রেয়। মোহমুক্ত মানুষ কোনো কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না। ত্যাগবাদের পথে চললে জীবনের কামনা-বাসনা ধীরে ধীরে কমতে থাকবে। তখনই মানব-জীবন সুখের হয়।

কাম, ক্রোধ, হিংসা, দম্ভ, মোহ, লোভ, অনাচার প্রভৃতি অশুভ গুনগুলি আসুরিক সম্পদ। এইগুলি তমঃগুণের প্রকাশ। তাই এসব গুণ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। সব সময় হাসিখুশি, আনন্দে থাকার চেষ্টা করুন। তাহলে এই অশুভ গুণগুলি আস্তে আস্তে বিদায় নেবে। জীবনে শান্তিই মানুষের পরম প্রাপ্তি। তামসিক ও রাজসিক জীবনের চেয়ে সাত্ত্বিক জীবন অনেক শ্রেয়। যেখানে অপার শান্তির খোঁজ পেতে পারেন। ত্যাগের পথে অবিলম্বে পরম শান্তি লাভ হয়। জীবনের দুঃখ কষ্ট অনেকটাই লাঘব হয়ে যায়।

সবশেষে স্বার্থত্যাগ একটি বড় ত্যাগ। অপরকে ভালোবাসতে শেখায়। পরোপকারে মন নিয়োজিত করলে মানসিক শান্তি আসে। মন ভাল থাকে। মমত্বশূন্য, প্রশান্ত-চিত্ত ব্যক্তিই জীবনে অনেক বেশি সুখী। সমাজসেবায় আমরা নিজেদের নিয়োজিত করতে পারি।

ঘাড়ের ব্যথা ও মাথাঘোরা কমাতে আকুপাংচার

ডা. সন্দীপ সেনগুপ্ত

মোবাইল : ৯৮৮৩১২০৭৬১

ঘাড়ের ব্যথা

ঘাড়ে ব্যথা যার হয়েছে সেই হাড়ে হাড়ে টের পায়— এ ব্যথা কী যে ব্যথা! ঘাড়ে ব্যথা নানা কারণে হতে পারে। শোওয়ার দোষে, ঘাড়ে চোট লেগে, ঘাড় ঘোরাতে গিয়ে, মচকে গিয়ে এবং আরও নানা ভাবে। এগুলি সাময়িক সমস্যা। অল্প বিশ্রাম, গরম সেঁক ইত্যাদিতেই সেরে যায়। কিন্তু সমস্যা যখন সারভাইকাল স্পন্ডাইলোসিসের কারণে হয় তখন তা অল্পে কমে না এবং রোগীকে ক্রমশ জটিলতর সমস্যার দিকে নিয়ে যায়।

সারভাইকাল স্পন্ডাইলোসিসের কারণ

দীর্ঘকাল ধরে ঘাড়ের ওপর চাপ পড়ে এমন যেকোনো কাজেই রোগটি ঘটতে পারে। যেমন ঘাড় ঝুঁকিয়ে লেখা, কম্পিউটারের কাজ, সেলাই বা ছবি আঁকা প্রভৃতি। এছাড়া হঠাৎ লেগে যাওয়া কোনো চোটও পরবর্তীকালে রোগটির সৃষ্টি করে। নরম অথবা অসমান বালিশে দীর্ঘকাল শুলেও স্পন্ডাইলোসিস হতে পারে। এছাড়া স্যাঁতসেঁতে ভিজে পরিবেশও এই রোগ সৃষ্টিতে বড় ভূমিকা নেয়।

সারভাইকাল স্পন্ডাইলোসিসের লক্ষণ

রোগটি মূলত চল্লিশ বছরের উর্ধ্ব ব্যক্তিদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। কিন্তু জীবনযাত্রার পরিবর্তনের সাথে সাথে কমবয়সীদের মধ্যেও রোগটি দেখা যাচ্ছে। রোগটির প্রাথমিক লক্ষণ হল ঘাড়ে ব্যথা এবং ঘাড়ের পেশিতে শক্ত ভাব। ঘাড় ঘোরাতে গেলে এই ব্যথা বেশি করে অনুভূত হয়। অনেক সময় মাথা ঘোরা এবং চোখে অন্ধকার দেখার (হঠাৎ করে) মতো লক্ষণ দেখা যায়। কিছু ক্ষেত্রে ঘাড়ে ব্যথা একদিক বা দু'দিকের হাতে বা পিঠের ওপরের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক সময় ঘাড়ে কোনো ব্যথাই থাকে না, কিন্তু হাতে অবশ ভাব এবং হাতের আঙুলে ঝিনঝিন করা লেগেই থাকে। এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগের লক্ষণ এবং শারীরিক পরীক্ষার মাধ্যমেই রোগটিকে চিহ্নিত করা যায়। তবুও নিশ্চিত হওয়ার জন্য এক্স-রে করা হয়। এই পরীক্ষায় ঘাড়ে অবস্থিত মেরুদণ্ডের সারভাইকাল ভার্টিব্রায় ক্ষয় ধরা পড়ে। কিছু ক্ষেত্রে কাঁটার মতো অনুভূতি বা অস্টিওফাইট দেখতে পাওয়া যায়।

চিকিৎসা

সারভাইকাল স্পন্ডাইলোসিসে প্রচলিত চিকিৎসা হল ব্যথার ওষুধ, ঘাড়ের ব্যায়াম, সারভাইকাল কলার এবং ট্রাকশন। অনেক সময়ই এগুলি কোনো স্থায়ী সমাধান দিতে পারে না। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে সামান্য উপশমও মেলে না। এরকম অবস্থায় বহু রোগী আকুপাংচার চিকিৎসা করাতে আসেন। কেউ অন্যের মুখে শুনে, কেউ নিজের কৌতূহলে। এদের মধ্যে অধিকাংশই সঠিকভাবে চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণ করে সুফল লাভ করেন।

আকুপাংচার, এই প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতিতে শরীরে অবস্থিত কিছু নির্দিষ্ট বিন্দুতে অতি সূক্ষ্ম সূচ ব্যথাহীনভাবে ফোটানো হয়। সূচগুলি ১৫-২০ মিনিট ফোটানো অবস্থায় থাকে। প্রয়োজন অনুযায়ী সহনশীল মাত্রায় বৈদ্যুতিক উত্তেজনা (স্টিমুলেশন) এবং মক্সা নামক ভেষজের সেঁক দেওয়া হয়। সূচগুলি ঘাড়ে ও হাতে ফোটানো হয়। এছাড়া আক্রান্ত স্থানে হ্যামারের সাহায্যে মৃদু আঘাতও করা হয়। যা রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে ব্যথা কমাতে সাহায্য করে।

আকুপাংচার চিকিৎসায় শরীরের বাইরে থেকে কোনো রাসায়নিক প্রয়োগ করা হয় না। এই পদ্ধতিতে শরীরে মধ্যে থাকা নানা রাসায়নিক যেমন ব্যথানাশক, ইমিউনিটি বর্ধক, প্রদাহনাশক প্রভৃতির মাত্রা কমানো-বাড়ানো হয়। এক কথায় শরীরের মধ্যে ভারসাম্যকে ঠিক করার মাধ্যমেই রোগ নিরাময় করে আকুপাংচার।

সতর্কতা

● ঘাড়ের ওপর চাপ পড়ে এমন কাজ করা চলবে না। ● কাজ করার সময় ২০-৩০ মিনিট অন্তর ঘাড়টিকে বিশ্রাম দিতে হবে। ● নিয়মিত ঘাড়ের কিছু ব্যায়াম করতে হবে। ● বেশি নরম বা বেশি শক্ত বালিশ ব্যবহার করা যাবে না। ● হাত বা কাঁধে বেশি ওজন নেওয়া যাবে না।

এরকম কিছু সতর্কতা মেনে চললে এবং ধৈর্য ধরে আকুপাংচার চিকিৎসা নিলে ঘাড়ে ব্যথার রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারবেন।

মাথাঘোরা

৪৫ বছরের বিনোদবাবু সরকারি চাকরি করেন। এই সেদিন অবধি সুস্থ-সবল-স্বাভাবিক ছিলেন। সপ্তাহ খানেক ধরে অনুভব করছেন তার মাথাটা কখনও সখনও ঘুরছে। প্রথমে এটাকে তত গুরুত্ব দেননি, ভেবেছিলেন কাজের চাপে বা রক্তচাপ বেড়ে গিয়েই বুঝি এমনটা হচ্ছে। কিন্তু লাগাতার এই অস্বস্তিকর অবস্থা চলার পর তিনি গেলেন ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার রক্তচাপ ও অন্যান্য পরীক্ষায় কিছু অস্বাভাবিকতা পেলেন না। বরঞ্চ পরামর্শ দিলেন চোখটা একবার পরীক্ষা করিয়ে নিতে। সঙ্গে মাথাঘোরা কমানোর ওষুধও দিলেন। ওষুধের প্রভাবে কিছুদিন ঠিক থাকলেন বিনোদবাবু। কিন্তু দশ-বারোদিন পর ফেরে একই সমস্যা। ইতিমধ্যে চোখ, কান সব পরীক্ষা করানো হয়ে গেছে। সবই স্বাভাবিক।

বিনোদবাবু কোথায় শুনেছিলেন সার্ভাইকাল স্পন্ডিলোসিসেও নাকি মাথা ঘোরে! তাই এবার গন্তব্য অর্থোপেডিক ডাক্তারের কাছে। তাঁর নির্দেশে হল ঘাড়ের এক্স-রে সহ বেশ কিছু পরীক্ষা। ফলাফল পূর্ববত। তবুও ডাক্তার দিলেন ঘাড়ের ব্যায়াম, ট্রাকসনের মতো কিছু পরামর্শ। কিন্তু মাথা ঘোরা কম-বেশি চলছেই। সঙ্গে নতুন উপসর্গ যোগ হয়েছে কানে সোঁ সোঁ আওয়াজ। নানারকম চিকিৎসায় বীতশ্রদ্ধ বিনোদবাবু ভেবেছিলেন আর কোনো চিকিৎসাই করাবেন না। এই সময় তার এক বন্ধুর পরামর্শে আকুপাংচার করিয়ে শেষ একটা চেষ্টা করতে এলেন।

বিনোদবাবুর সমস্যা শুনে এবং তাকে দেখে (সঙ্গে আগে হওয়া অন্যান্য পরীক্ষার রিপোর্টগুলোও দেখে) বোঝা গেল মাথা ঘোরার কারণ ঘাড়ে নয়, রক্তচাপের জন্যও নয়, ওটি লুকিয়ে আছে বিনোদবাবুর কানে। বহুদিন আগে উনি কানে চোট পেয়েছিলেন, বার দু'য়েক কানে ইনফেকশনও হয়েছিল। তখন থেকেই বাঁ-কানে সামান্য কম শুনতে পান। আগে অল্প সোঁ সোঁ আওয়াজ হচ্ছিল, এখন তা বেশ জোরেই হচ্ছে। সমস্ত বিবরণ থেকে বোঝা গেল বিনোদবাবুর কানের করোটির যন্ত্র এবং সেমিসার্কুলার ক্যানাল নামক অংশ দুটো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তার ফলে যে রোগটি হয়েছে তাকে ডাক্তারি পরিভাষায় বলে মিনিয়ার'স সিনড্রোম। ওই দুটো অংশ শরীরের ভারসাম্য রক্ষায় অন্যতম ভূমিকা নেয়। তাই ওইগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হলে মাথা ঘোরা, গা গোলানো, বমি ভাব, চোখে ক্ষণিকের জন্য অন্ধকার দেখা এসব লক্ষণ দেখা যায়।

এবার শুরু হল বিনোদবাবুর আকুপাংচার চিকিৎসা। আকুপাংচারের দৃষ্টিকোণ থেকে রোগটির প্রকৃতি নির্ধারণ করে, নির্দিষ্ট কিছু বিন্দু নির্বাচন করা হল। মূলত মাথায়, হাতে, পায়ের ওপর অবস্থিত বিন্দু নির্বাচন করা হল। মাথার বিন্দুগুলিতে অতি সূক্ষ্ম সুঁচ ফুটিয়ে মৃদু (রোগী সহ্য করতে পারেন এমন) বৈদ্যুতিক উত্তেজনা দেওয়া হল। ইলেক্ট্রোআকুপাংচার যন্ত্রের সাহায্যে এই ছন্দবদ্ধ বৈদ্যুতিক উত্তেজনা দেওয়া হয়। এর সাথে পায়ের দুটো বিন্দুতে সুঁচ ফুটিয়ে মক্সা নামক ভেষজের তাপও দেওয়া হল। এছাড়া ঘাড়, মাথা এবং কানের পাশে প্লামব্লসম হ্যামারের সাহায্যে মৃদুভাবে হ্যামারিং করা হল। ১৫-২০ মিনিট পর মৃদু সুঁচ তুলে নিলে, রোগী তখন স্বাভাবিক সব কাজই করতে পারেন। আকুপাংচার মস্তিষ্কের ভারসাম্য রক্ষাকারী অংশকে উত্তেজিত করে এবং কানের ভিতরের ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলোর মেরামত করে। ফলে গা গোলানো, বমি, মাথা ঘোরা প্রভৃতির উপশম ঘটে।

১০-১৫টি সিটিং নেওয়ার পরই বিনোদবাবুর সমস্যাগুলো অনেকাংশে কমে এল। এখনও অবধি

তার চিকিৎসা চলছে। বিনোদবাবুর কথায়, 'মাসে এক-দু'বার নিয়ে যদি দীর্ঘদিন ভালো থাকা যায়, তাহলে আকুপাংচার নিতে আমি আজীবন তৈরি।'

শেষে দুটি প্রাসঙ্গিক কথা। প্রথমটি হল, 'মাথা আছে তাই ঘুরতেই পারে' এরকম না ভেবে মাথা ঘোরার শুরুর সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। কারণ এটির পিছনে থাকতে পারে উচ্চ রক্তচাপ, রক্তাল্পতা, কানের সমস্যা এমনকি ব্রেন টিউমারের মতো রোগ।

দ্বিতীয়টি হল, 'সুঁচ ফুটিয়ে চিকিৎসা, চিনেদের চিকিৎসা, আকুপাংচার করলে ওষুধ কাজ করে না' এরকম হাজারটা ভুল ধারণা একসময় মানুষের মধ্যে ছিল। ইদানিং সে প্রবণতা অনেকটাই কমে গেছে। জানিয়ে রাখা ভালো, বিশ্বের ১৫০টির মতো দেশে আকুপাংচার চিকিৎসা হয়। সুঁচ নিয়ে ভীতিও আগের চেয়ে মানুষের মধ্যে এখন অনেক কম। তাই রোগ শুরু হলেই চিকিৎসা শুরু করান, আর দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন।

বিজ্ঞানই পথ দেখায়

তপন কুমার দাস

মানবদেহে অসুখ হয় প্রধানত রোগ— জীবাণু আক্রমণে। অত্যন্ত ছোট এক কোষী জীবাণু তিন রকমের। বড় হল প্রটোজোয়া, প্রতিস্টা গ্রুপের প্রাণী। চার রকমের হয়। তারা আমাশা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগ সৃষ্টি করে। ব্যাক্টেরিয়া অনেক রকম। বেশি অপকারী। কলেরা, টাইফয়েড, সিফিলিস, নিমোনিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ সৃষ্টি করে। ভাইরাস অতি ক্ষুদ্র। শরীরে আশ্রয় নিলে প্রাণী, বাইরে জড় পদার্থ। অনেক রোগের কারণ।

১৮৮৪ সালে বিজ্ঞানী ভেম্বারলেন ফিল্টার করে প্রোটজোয়া ও ব্যাক্টেরিয়া ছেঁকে বের করেন। পরে বিজ্ঞানী আইভ্যানোভস্কি ফিল্টার করে সলভ্যান্টে যা পাওয়া গেল তাকে ভাইরাল বলেন। ১৯৩১ সালে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে প্রথম ভাইরাস দেখা যায়। অতি ছোট ১০০ ন্যানো মিটার। সর্বাপেক্ষা ছোট প্রাণী। ১৯৫১ সালে রোজালিন্ড ফ্রাঙ্কলিন প্রথম মানুষের বংশগত ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কারণ হিসাবে মানব কোষে ডি-এন-এর ধারণা দেন। যা আসলে জিন। জানা যায় যে প্রোটিনের আবরণে আর-এন-এ হল ভাইরাস। ডি-এন-এ হল ডি অক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড, আর-এন-এ হল রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড। ছোট ভাইরাস মাত্র ২৪০টি ইনফরমেশন ধারন করে। মানুষের জিন ধারন করে তিন বিলিয়ন ইনফরমেশন। জিন গবেষণা আর ভাইরাস গবেষণা এইভাবে সম্পর্কিত হয়ে আছে। ভাইরাস গবেষণা হলেই তাকে জৈব অস্ত্র গবেষণা মনে করার কারণ নেই। চিনের থেকে ভাইরাস নিয়ে অনেক বেশি গবেষণা হয় চিনের বাইরে। এখন করোনা ভাইরাস নিয়ে পৃথিবীতে গবেষণা হচ্ছে ১৫০টি গবেষণাগারে।

ভাইরাস গবেষণার ফলেই এখন প্লেগ, জলাতঙ্ক, বসন্ত, পোলিও প্রভৃতি রোগের প্রতিরোধ হয়েছে। ক্যান্সার, এইচ-আই-ভি, বি হেপাটাইটিস প্রভৃতি রোগের গবেষণায় অনেক অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়েছে। হংকংয়ে বি হেপাটাইটিসয়ে ভ্যাক্সিন প্রয়োগের পথে। ক্যান্সারের টিউমার সৃষ্টিকারী রেট্র ভাইরাসকে অনেকটা জানা গেছে। কিছুদিন আগে গবেষণাগারে একটি ট্রেতে ব্যাক্টেরিয়া নিয়ে গবেষণার সময় দেখা গেল, পাশে রাখা প্লাস্টিকের টুকরো নেই। জানা গেল টুকরোগুলো ব্যাকেটিরিয়া গিলে ফেলেছে। মনে করা হচ্ছে, নদী-সমুদ্রে পরিষ্কার করার জন্য এই ব্যাক্টেরিয়া ব্যবহার করা যাবে। ব্যাক্টেরিয়া ভাইরাস নিয়ে গবেষণা এইসব কারণে এখন মানব কল্যাণের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি।

জৈব জগতে ক্রমজোম, জিন, প্রোটিন, ভাইরাস প্রভৃতির উপর ও জড় জগতে ন্যানো পদার্থের উপর গবেষণা এক নতুন আলো দেখাচ্ছে। রহস্যপ্রিয়, অলৌকিক-আকৃষ্ট হয়ে বিজ্ঞানের উপর বৃথা দোষারোপ করে লাভ নেই। জিন প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডলি ভেড়ার জন্মের সময়ও প্রতিবাদে অনেক হৈচৈ হয়েছিল। তাতে জিন গবেষণা থেমে থাকেনি। বিজ্ঞান করোনা ভ্যাক্সিন আবিষ্কার করলে ঠাকুর-ভক্তরা হয়ত ভ্যাক্সিন নিয়ে বলবে ঠাকুরই বাঁচিয়ে দেবে। যদি আমরা বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করি— দেখা যাবে শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানই মানুষের কাছে অপরিহার্য থাকবে।

—ঃ কবিতাগুচ্ছ ঃ—

শরৎ বোস লেনের রোজনামচা

বীথি কর

দোতলার বারান্দায়
মাঘের বিকেল নামে রোজ
সকাল থেকে অনবরত সদরদরজায়
শিমুল পিসির বিরহগান,
কে কবে একখানা চিঠি লিখে নিরুদ্দেশ হয়েছিল,
খবর কিন্তু পাকা।
নড়বড়ে বাড়ির পশ্চিমে
ধেরে ইঁদুরের খোলসা গালগল্পে দুপুর
কাটে নিত্যকালির।
বড়ো চেনা দৃশ্য আঠারো নম্বর
শরৎ বোস লেনের।
আঠালো চিটচিটে পর্দায় দে-বাড়ির চিলেকোঠায়
আঁচড় কেটে রোদ পড়ে কদাচিৎ,
অলস দিন চলে যায় পত্রিকার এপিঠ-ওপিঠ খবরে,
তবুও ঘুম আসে না,
যেন মরীচিকা।
সংসার বলতে নিবারণ আর
ওর স্ত্রী, ফ্রেমে বাঁধা।

নীচে ঘটাংঘড়াং শব্দ মিশে একাকার
কাশি আর ডিসি ফ্যানের।
ভরপেট ঘুম আসে
এই বাড়ির রাস্তায়, কাশীরামের হাত-রিকশায়।
সন্ধ্যা হলেই সুর করে নামতা মুখস্থ করে এই
বাড়ির সর্বকনিষ্ঠ সদস্য—ফুলি,
আর তারপর,
ভাড়াটে সুবিমল শেষ ট্রেনে বাড়ি ফিরে
হজমিগুলির হিসেব গোনে।
তার বিক্রির শেষ অঙ্কটা লক্ষ্মীর ঘটে চালন করে
সকালের পান্তায় মরিচ ডলে রাতঘুম দেয়।
রাত নামে, অন্ধকার হয় ছাদ কার্নিশ
বারান্দা আর তিনতলার সিঁড়ি।
এখানে প্রেম ত্যাজ্য।
তাই দিনভর সঙ্গম হয় অপ্রেমে থাকা দুটো মানুষের।
ঘোষবাবু আর প্রোমোটার শম্ভুর।
বাড়িটা আর কবিতা নেই,
যেন রহস্য রোমাঞ্চ উপন্যাস।

মুক্তি

খগেশ্বর দাস

ভরে রেখেছি ঠাণ্ডা জল
ভরে রেখেছি মায়া
এমন পারিপাট্যে আসল
মানুষটি আবছায়া।

ইচ্ছে ছিল পদ্মা বিহার
জলের ওষ্ঠ চুমে
প্রেম জানে না মগ্ন মাঝি
অচৈতন্য ঘুমে।

আমরা জানি গাঙের পানি
তল মেলে না তার
খাঁচার জীবন যন্ত্রণাময়
মুক্তিতে সাঁতার।

কবিতা শেষ, পড়ো

ভবানীশংকর চক্রবর্তী

আবহাওয়া নিয়ে পড়েছি মুশকিলে
মেলে না ফোরকাস্টিং
মেঘ-না-রোদ কী চেয়েছি!
ডিসগাস্টিং, ডিসগাস্টিং!!

কোর্ট কাচারির জবর খবর
তবু স্বপ্নে ভয়ের তাড়া
গুল চলে না গাপ্পাও না
ডামাডোলে জাগে পাড়া

ইঁদুর রাতে জাল কেটে যায়
কুটুস চুপিচুপি
পাবলিকও জাল কাটতে জানে
পরাতে জানে টুপি

এবার বসি সমাধিতে
যা খুশি তা করো
বিচ্ছেদ নয় পূর্ণচ্ছেদে
কবিতা শেষ, পড়ো

আকাশকুসুম

প্রদীপ চক্রবর্তী

বামন তবু চাঁদমুখে স্পর্শসুখ হেতু
বাড়ানো তার হাত ওই আকাশে
মনে রেখো বাছা
উন্মার্গগামিতায় গুচ্ছের হয়রানি
যেন পা দুখানি মাটি ছুঁয়ে থাকে
ব্যোমচারী হতে চেও না ব্যাকুল

সম্পর্কসূত্র ছিন্ন করা নিরন্তর
সে-ও এক সম্পর্ক
আদতে কোনো মাখামাখিই একবগ্গা
নয় চিরকাল

তোমার এককালের ভালোবাসার ঘর
টলমল করে হাঁটি হাঁটি হামাশিশুর মতো
তোমার গড়ে তোলা বোঝাপড়ার
মাটির গভীরে না-যাওয়া শিকড়ের
বাঁধন ক্রমশ আলগা—আলগা
উৎসমুখে তবু স্বেচ্ছাবন্দি গোঁ
কোন্ ধর্মরক্ষা এইভাবে কে জানে!

কবিতার পথে

ঝুমা সরকার

এক এক করে ভেঙে পড়ছে সব
শবের মিছিলে সবের আর্তনাদ।

মেধা রাজপথে কাঁদছে
মনুষ্যত্বের মৃত্যু হচ্ছে প্রতি পল
গরিবের ঘর চুরি, রাজস্ব চুরি,
এমনকি সম্ভ্রমও চুরি যখন
তখন আমরা ভালো থাকার প্রচেষ্টায়
না-দেখা না-জানার ভূমিকায়
রোজ কি পিছন দিকে এগিয়ে চলেছি?

অনেক দেরি হয়ে গেছে, আর নয়
চলো জেগে উঠি স্ফুলিঙ্গ হয়ে।
শ্রমিক কৃষকের ঘামে
রক্তাক্ত শরীরে, বিপ্লবীর শ্লোগানে
যেমন খিদে জেগে থাকে
তেমনই খিদে জ্বলে উঠুক আজ কবিতায়
মানচিত্রের গা ঘেঁষে
প্রতিবাদের কলমটাকে
আরেকটু ধারালো করে
চলো আমরা কবিতার পথে হাঁটি।

একদিন

আশিস সান্যাল

একদিন ছিলে তুমি,
আশা ছিল
পার হব দিগন্তের সমস্ত প্রান্তর।
আজ আর তুমি নেই
ভাষা নেই
কালোয় ঢেকেছে যেন সব চরাচর।

তুমি আজ কোনখানে?
কোন্ মৃত নগরীর নিস্তব্ধ আকাশে?
পারো কি তুমি ফের
অন্ধকার আলপথে দুই পা বাড়াতে?
কে কবে পেয়েছে তার হারানো সময়?
সামনে দাঁড়িয়ে আছে শুধু মৃত্যু ভয়।

মৃত্যু দেখিনি
তবু মৃত্যু ডাকে সংযত নীরব।
একদিন অনিবার্য বুকে তার
হবে জানি অনন্ত উৎসব।
দরোজা খোলো হে আকাশ
ছিন্ন করে সমস্ত বন্ধন।
বেঁচে থাক এ পৃথিবী
অরণ্য প্রান্তর আর গজারির বন।

১ এপ্রিল থেকে ২০২৩ - ২০২৪ সালের সদস্যপদ নবীকরণ শুরু হয়েছে। অনতিবিলম্বে সদস্যপদ নবীকরণ ও প্রবীণবার্তার জন্য ৫০/- টাকা জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

অপরাহত মানুষ

অমল কর

সবুজের আঁচলে এখন নেই কোনো ঢেউ
বাসন্তিক আহ্বান নেই রসময় কোকিলে
ভ্রমরের নেই গুঞ্জন পরাগে নেই মিলন
বলদ প্রসূতি সাজে বাজা গাই গোয়ালে
বিষগিঁটে বাঁধা এখন হৃদয়ের অমল গ্রন্থি
ভুলের পইঠায় জড়ের বিকারে চরাচর
ল্যাজের মোচড়ে আকাট গবা গোবিন্দ
দ্বিপদী শ্বাপদের বিচরণে রাজ্য অরণ্যভূমি
ভূতুম প্যাঁচাদের মতো দুষ্কৃতির মৃগয়াক্ষেত্র
এপাড়া-ওপাড়া শুধু কামদুনি সন্দেশখালি
চুরি লুঠ হনন ধর্ষণ লাফাঙ্গার জঞ্জালে
আকাশ ফুঁপিয়ে কাঁদে মর্মনাদে আর্তনাদে

মানবিকতা এক অনিঃশেষ স্নিগ্ধ প্রবাহ—
মনুষ্যত্ব কাড়তে পারে না কোনো দৈত্যদানো
পেশিশক্তি-রাজশক্তির ঘৃণ্য শানিত কৃপাণে
দমাতে পারে না স্ফুরিত মিলিত প্রতিবাদ
প্রতিস্পর্ধী প্রতিরোধকে কোনো স্বৈরী
পোড়াতে পারে না গনগনে আগুনে

স্বপ্ন হয়ে গান হয়ে প্রেম হয়ে জয় হয়েই
প্রত্যাবর্তন চায় লড়াকু অপরাহত মানুষ।

আমার ভাষা আমার জননী

মৃণাল দত্ত

কপোতাক্ষ তীরে যে নারী বসে আছে
বিপন্ন চিত্তে

পরণে লাল পাড় শাড়ি
তার উজ্জ্বলতায় চন্দ্র ম্লান
সূর্য দীপ্তি আরো প্রখর
তেজময়।

সে আমার মা।
ঔপনিবেশিক দাপটে আজ সে অবহেলিত।
একুশের এক খর প্রহরে
তারই সন্তান বরকত সালাম
অর্ঘ দিয়েছে কার রাতুল চরণে।
কে আজ ফেরাবে তার মুখে হাসি?
আমরা কৃতঘ্ন সন্তান
পরদেশি বুলিতে ভুলে আছি তাকে
এই চিত্তে তুমি এসো মা, বজ্র গর্ভ হয়ে এসো
তুমিতো আমাদের তৃষ্ণার জল
পিপাসার্ত হৃদয়ের দগ্ধহীন বেলা
এসো জননী নুপূর ছন্দে এসো,
আলোড়িত করো অবিবেকী সন্তানে
এসো মা।

অনন্ত

সন্দীপ জানা

এভাবেই শেষ কিংবা অন্য কোনোভাবে
যেখানে থামার ছিল থামতে পারোনি বলে
আজও থামা হল না
পথ হেঁটে যায় এক পথ থেকে
আর-এক পথে
পায়ে ধুলো মেখে টলতে টলতে
হেঁটে চলে সমাপ্তির সংকল্প যত

তবু একদিন হল শেষ—
সেই কাঙ্ক্ষিত পরিণতি
কিন্তু তারপর?
তৃপ্তি নেই, ঘুম নেই— বিছানা-জোড়া শূন্যতা
সব চুকে-বুকে যাওয়া ততটা সহজ নয়
সময়ের স্রোতে শুরু হবে ষড়যন্ত্র, কানাকানি
সমাধির ফলকে অনায়াসে লিখে দিতে পারো
আরও কয়েকটি জন্ম-তারিখ

বাচালনামা

কাজী নজরুলের 'জামালুদ্দীন' প্রথম ছাপা হয় 'পয়গাম'-এ

কবির ৬৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে

গাজী মহম্মদ আবুবকর

'যেখানে দেখিবে ছাই / উড়াইয়া দেখ তাই / পাইলেও পাইতে পার অরূপরতন'— এটা কথার কথা নয়। মাঝে মাঝে কথাটা ফলেও যায়। স্ক্র্যাপ জিনিসপত্র ঘাটাঘাটি করা আমার স্বভাব। পুরোনো জিনিসপত্র দেখলে, পুরোনো বই খবরের কাগজের পাতা ওল্টালে পুরোনো দিনের গন্ধ পাই। অজানা জীবনে, না-দেখা জগতে হারিয়ে যাই।

মাত্র কয়েক মাস আগে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল আন্তর্জাতিক মুদ্রা উৎসব। দেশবিদেশের কয়েন, ভারতের প্রাচীন কালের মুঘল আমলের কয়েন, রিজার্ভ ব্যাংকের বিভিন্ন সময়ে ইস্যু করা স্মারক অরিজিনাল কয়েন, দেশবিদেশের কারেন্সি নোট, ডাকটিকিট, মেমেন্টো ইত্যাদি ছিল উৎসবের প্রদর্শনীর দ্রষ্টব্য। মানুষের ভিড়ে উৎসব হয়েছিল জমজমাট, এলাহি ব্যাপার সব। সেখানে অনেকটা সময় হারিয়ে গিয়েছিলাম আমি। এদিকে, উৎসবের বাইরে সরু রাস্তার দুধারে বসে পড়েছিল প্রচুর স্ক্র্যাপ জিনিসপত্রের দোকানদাররা। এরা পুরোনো জিনিসপত্র, ফটো, মুদ্রা, পুরোনো বাতলি টাকার নোট, এলবাম, নবাবী আর জমিদারি ঘরানার তৈজসপত্র, কাপপ্লেট, ফটো স্ট্যান্ড ইত্যাদি নিয়ে হাজির হয়েছিল। কেউ কিনছে, কেউ বেচছে যার যেমন পছন্দ, যার যা যা প্রয়োজন আর আর্থিক সঙ্গতি। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা দিবসের স্টেটসম্যান পত্রিকা, গান্ধী-চশমা অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধী যেমন চশমা পরতেন তার ইমিটেশন।

আমি হুজুগে মানুষদের পছন্দ অপছন্দের দিকে খেয়াল করছিলাম, আর তাদের দরদস্তুর করার রকমসকম দেখছিলাম। হঠাৎ আমার চোখ আটকে গেল আশি বছরের পুরোনো 'পয়গাম'-এর অর্থ-সাপ্তাহিক পত্রিকার পাতায়।

তার প্রথম পাতায় ছাপানো আছে কাজী নজরুলের 'জামালুদ্দীন' নামের অপ্রকাশিত একটি কবিতা। পত্রিকাটির মুদ্রিত মূল্য তেরো পয়সা। অনেক দরাদরি করে সেটাই আমাকে কিনতে হল একশ টাকায়। দাম আর কমানো গেল না। কারণ, বিক্রেতার ঘ্রাণশক্তি প্রবল। সে ক্রেতার হাবভাব দেখে বুঝে নিয়েছে এই হলদেটে রং হয়ে যাওয়া আশি বছরের পুরোনো বাতিল কাগজখানা তার চাই-ই, যে-কোনো মূল্যে।

'পয়গাম' এই সংখ্যাটি ছিল কাজী নজরুলের ৬৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নিবেদিত। কবির উপবিষ্ট অবস্থায় তোলা একটি ছবি ছিল বাড়তি আকর্ষণ। পত্রিকার শিরোদেশে বড়ো বড়ো হরফে ছাপানে হয়েছে— বাঙালির প্রিয় লাইন— 'মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান'। তারই সঙ্গে সুর মিলিয়ে নজরুলের বিভিন্ন কবিতার সুচয়নিত পঙক্তিসমূহ। কবির ফটোর নীচে তারিখ—২১.৫.১৯৬৫। পত্রিকাটির প্রকাশের তারিখ—২৪.৫.৬৫, অথ:াৎ কবির ৬৬তম জন্মদিনের একদিন আগে। পত্রিকায় উল্লেখ আছে 'জামালুদ্দীন' কবিতাটি আবদুল আজীজ আল আমানের সৌজন্যে প্রাপ্ত। আজীজ সাহেব ছিলেন অগ্রগণ্য নজরুল গবেষক। পরবর্তীকালে তিনি 'হরফ' প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন এবং নজরুল রচনাসম্ভার প্রকাশ করে আপামর বাঙালি পাঠককে কৃতার্থ করেন। নজরুল ঘিরে তাঁর ছিল বহুমুখী কর্মধারা। যাই হোক, উক্ত পয়গাম পত্রিকায় তাঁর 'নিশান বর্দার নজরুল' নামে একটি মূল্যবান লেখা ছাপা হয়, যেখানে তিনি বলেছেন যে নজরুলকে বিদ্রোহী কবি বলে আখ্যা দেবার চেয়ে যৌবনের কবি বলাই সঙ্গত। কারণ, কবি জীবনভর তাঁর সাহিত্য ও সঙ্গীতে যৌবনেরই জয়গান গেয়েছেন। পয়গামের এই সংখ্যায় প্রখ্যাত সমন্বয়বাদী সাহিত্যিক রেজাউল করিম-এর একটি লেখা আছে। কবিতা আছে বাগবুল ইসলাম, আবদুল মজিদ, কাজী আমিন উদ্দীন আহমেদ ও ফিরোজ উদ্দীন আহমেদ-এর। আরও একটি নিবন্ধ লিখেছেন আবদুল হামীদ। সম্পাদকীয় শিরোনাম করা হয়েছে— 'নজরুল জয়ন্তীতে আমাদের প্রস্তাব'! যাই হোক, বহু চড়াই উৎরাই পেরিয়ে পয়গাম নামের পত্রিকা আজ ইতিহাসের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। প্রাসঙ্গিক আলোচনা আপাতত এই পর্যন্ত থাক।

আমাদের এবার জানতে হবে— কে ছিলেন জামালুদ্দীন, যার প্রশস্তি স্বর্ণাক্ষরে রচনা করেছিলেন নজরুল? এখান উল্লেখ করতেই হয়, আঠারো লাইনের এই কবিতা যখন ছাপার অক্ষরে পাঠকের সামনে হাজির হয়েছিল তখন কবি বাকশক্তি রহিত, জড়ভরত তাঁর শারীরিক অবস্থা। লেখাটি রচনার সময়কাল হয়ত আজও অনির্ণীত। কবিতাটি পাঠের পর পাঠকের ধারণা জন্মায় যে বিশ্বের প্রগতিপন্থী মুসলিমদের অগ্রগণ্য নেতা ছিলেন জামালুদ্দীন বা জামালুদ্দীন আফগানি। তিনি 'জামাল আল দিন আল আফগানী' নামে বা শুধুমাত্র 'আল আফগানী' নামে পরিচিতি লাভ করে ছিলেন। ১৮৩৮ সালে তাঁর জন্ম হয় কুনার আফগানিস্তানে। মাত্র ৫৯ বছর বয়সে তাঁর প্রয়াণ ঘটে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে। তাঁর জীবনচর্চার হালহকিকত জানলে তাঁকে বিশ্বনাগরিক আখ্যা দিলেই সঠিক হয়। ইসলামী আধুনিকতা, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, নাগরিক অধিকার, যুক্তিবাদ, সমতা ও উন্নয়নের মতো বিষয় নিয়ে দুনিয়া চষে বেড়াতেন মানুষকে সঠিক দিশা দেখানোর লক্ষ্যে। তাঁর চরিত্রের ওপর যাদের সীমাহীন প্রভাব পড়েছিল সেই তালিকায় আছেন ইবন সিনা, আল ফারাবী, নাসির আল দিন, আল তুসী, মোল্লা সাদ্র প্রমুখ মণীষীদের চিন্তাধারা। জালালউদ্দিন চেয়েছিলেন ব্রিটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্যান-ইসলামিজম ও সুন্নী-শিয়া সংহতি হয়ে উঠুক হাতিয়ার। কাজী নজরুল তাঁকে এশিয়ার নবপ্রভাত সূর্যপুরুষ বলে মহিমান্বিত করেছেন তাঁর কবিতায়। হজরত ওমর ফারুখের সাম্য, হজরত আলীর জুলফিকার, অসমসাহসী খালেদের সঙ্গে তাঁর তুলনা করেছেন। নজরুল জড় ও ক্লীবের

মাঝখানে তাঁকেই আদর্শ মুসলিম হিসেবে তুলে ধরেছেন। সাম্য মৈত্রী ও মানবতার খাদিম তিনি। আঠারো পঙক্তির কবিতার বিন্যাসে দেখা যায় চারটি স্তবক। প্রথমের দুটি পঙক্তি আলাদা রয়ে গেছে।

'বুকের রক্তে সুবহ সাদেক আনিয়া হলে শহীদ
জাগিল কাবুল মেসের ইরান তুর্ক আর হিন্দ।'

শৈবতীর্থ রুদ্রনাথের গুহা মন্দিরে একটি রাত

সমীর কুমার ঘোষ

আমার অফিস সহকর্মী আকাশবাণীর সেতারবাদক রবি সেন ১৯৭৮ সালে গোমুখ দর্শন সেরে ফিরে এসে মিউজিক কম্পোজার সোমেশ ঘোষ ও বিমল ভূষণকে গঙ্গোত্রী, গোমুখ ও হিমালয়ের কিছু প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর মনমুগ্ধকর ছবি দেখান। কৌতূহল বশে সে ছবি আমিও দেখি। পরে হিমালয়ের পথ ঘাট সম্পর্কে বিশদ জানতে চাইতে রবিদা বলেন সামনের বছর পঞ্চকেদার দর্শনে যাবার ইচ্ছে আছে তুমি যদি যেতে চাও তো বল। একবার হিমালয়ে গেলে তোমার সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে। এরপর কাজের ফাঁকে রবিদা যখনই আমাদের সঙ্গীত বিভাগে আসতেন দেখা হলে ঘুরে ফিরে পঞ্চকেদার প্রসঙ্গে আলোচনা চলত। ইতিমধ্যে অফিস লাইব্রেরিতে হিমালয় প্রেমিক উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের "পঞ্চকেদার" ভ্রমণ বইটি পড়ে হিমালয় দর্শনের জন্য মনে তীব্র বাসনা জাগে। অবশেষে ঠিক হয় ২০শে মে ১৯৭৯ সালে আমরা পঞ্চকেদার দর্শনের জন্য যাত্রা করব। রবিদার এক ছাত্র (স্বপন মিত্র), এক বন্ধু (শম্ভু বিশ্বাস), আসানসোলের তিন ছাত্রী (দুলালী বিশ্বাস, কৃষ্ণা স্বরূপা, জয়াদি) ও আমি মোট সাত জন পঞ্চকেদার ও বদরিবিশাল দর্শনের জন্য প্রস্তুত হই। এদিকে রবিদার পূর্ব পরিচিত কুণ্ডু স্পেশাল ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর ঠিক হয় আমাদের সঙ্গে তিনজন যথা একজন ম্যানেজার, কুক ও হেল্পার সম্পূর্ণ কোম্পানির খরচে পাঠাবে। ওরা আমাদের এই দীর্ঘ যাত্রায় নানাভাবে সাহায্য করবে এবং এই রুট সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে ফিরে এসে পরবর্তীকালে তীর্থযাত্রী নিয়ে যাবে। আমরাও দেখলাম ওরা গেলে আমাদের সুবিধা হবে— থাকা, খাওয়া, গাড়ির সব ব্যবস্থায় ওরা করবে ফলে আমরা নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াতে পারবো। কুণ্ডু স্পেশালের এই ব্যবস্থাপনায় আমরা সানন্দে রাজী হই।

২০ মে দুন এক্সপ্রেসে চেপে ২২ মে সকালে হরিদ্বার পৌঁছে শ্রী গোপাল ধর্মশালায় উঠি। ২৫ মে নারায়ণকে সাক্ষী রেখে হর-পার্বতীর বিবাহস্থল ত্রিযুগীনারায়ণ মন্দিরে দেবদর্শন সেরে বিকালে গৌরীকুণ্ডে ফিরে আসি এবং একটি রাত অবস্থান করি। স্থান মাহাত্ম্যে জানতে পারি হর-কোপানলে মদন বা কামদেব ভস্মীভূত হবার পর মা জগদম্বা দেবাদিদেব মহাদেবের অর্ধাঙ্গী হওয়ার মানসে এই পবিত্র স্থানে ঘোরতর তপস্যায় রত হন। পরদিন গৌরীকুণ্ডে স্নান সেরে কেদারনাথ যাত্রা করি। আবহাওয়া অনুকূল না থাকায় রামওয়ারা চটীতে রাত্রি যাপন। ২৭ মে সকালে প্রাণান্তকর চড়াই পথ অতিক্রম করে দেবদেখনী পৌঁছে

বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়ি। চোখের সামনে যেন এক বিশাল পর্দায় ভেসে উঠল রঙিন সর্বলোক-বিস্ময়কর কেদারের বিশাল উত্তুঙ্গ উজ্জ্বলতম চিরনীহারময় গিরিশৃঙ্গের সানুদেশে ভোলামহেশ্বরের জগৎবিখ্যাত মন্দির। মন্দিরের গর্ভগৃহে মহিষের পৃষ্ঠদেশের ন্যায় শ্যামবর্ণের বিশাল শিলাসদৃশ ভগবান শ্রীকেদারনাথজীর দর্শন ও পুজো-পাঠ অন্তে শিবলিঙ্গের আলিঙ্গন। গতকাল অত্যধিক তুষারপাতের কারণে সকল যাত্রীদের নীচে নামিয়ে দেওয়া হয় ফলে গর্ভগৃহে আমরাই কয়েকজন মাত্র ছিলাম হয়ত সে কারণেই শিবলিঙ্গের আলিঙ্গন সম্ভব হয়েছিল। অল্প কিছু সময় কেদারনাথে থাকার পর দুপুর ১ টায় আমরাও নেমে আসি গৌরীকুণ্ডের পথে। ২৮ মে সীতাপুর থেকে বাসে জুরানি। কালিমঠে রাত্রিযাপন ও পরদিন সকালে মায়ের পুজো-পাঠের পর লেঁখ হয়ে রাশি বা রাশু গ্রামে এসে পৌঁছলাম বেলা ১টা নাগাদ। স্কুল গৃহে রাত্রিবাস করে ৩০ মে গৌণ্ডার গ্রাম, বানতোলী থেকে প্রচণ্ড চড়াই পথ অতিক্রম করে বিকেল সোয়া চারটায় দ্বিতীয় কেদার (নাভির আকারে) মধ্য মহেশ্বর বা মদ্‌মহেশ্বর পৌঁছলাম। ৩১ মে মদ্‌মহেশ্বরের পুজো, পুষ্পাঞ্জলি ইত্যাদির পর টানা উৎরাই পথে বানতোলি, রাশুঁগ্রাম হয়ে লেঁখে পৌঁছলাম বিকেল ৭টায়। এসময় সন্ধ্যা নামছে রাত ৮টায়। এদিন ট্রেকিং হয়েছে প্রায় ২০ কিমি। ১ জুন লেঁখের স্কুলবাড়ি থেকে ট্রেকিং করে ছবির মতো সুন্দর এক গ্রাম মনসূনা হয় পৌঁছলাম গিরিয়াতে। এখানে একটু বিশ্রাম নিয়ে উখীমঠ পৌঁছলাম ১২.৩০ টায়। শীতকালে শ্রীকেদারেশ্বরের ও শ্রীমদ্‌মহেশ্বরের দেবতার পুজো এখানে হয়ে থাকে। এছাড়া বাণাসুরের রূপসী কন্যা উষা ও শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধর বিয়ের বাসর বসে এখানে। উষার নাম থেকে হয় উষা মঠ, পরবর্তীকালে উখীমঠ (৪,৩০০ ফুট)— অপরপারে গুপ্তকাশী। নানান মন্দির ছাড়াও রয়েছে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সুবিশাল অতিথি আবাস গৃহ। উখীমঠে রাতের বিশ্রাম নিয়ে পরদিন অর্থাৎ ২ জুন বাসে চেপে চোপতা পৌঁছলাম সকাল ৯টায়। এবং পৌঁছেই তৃতীয় কেদার তথা তুঙ্গনাথের বাহুর টানে আমরা এগোতে থাকি। টানা চড়াই ভেঙ্গে মন্দির প্রাঙ্গণে (১২,০৭২ ফুট) পৌঁছে যাই বেলা ১২.৩০টায়। এ পথে হিমালয়ের তুষারাবৃত শৃঙ্গগুলি চমৎকার দেখায়। বাবার দর্শন ও পুজো দিয়ে নেমে আসি দুপুর সোয়া দুটোয়। এবং সাথে সাথে পেয়ে যাই PWD ট্রাক। লাফাযাত্রায় মণ্ডল পৌঁছে যাই সাড়ে পাঁচটায়। মণ্ডলে রাত্রিবাসের জন্য স্থান নির্বাচিত হয় বাস্ট স্ট্যান্ড-এর পাশে বলবন্ত সিং-এর হোটেল।

মঙ্গলময় পরমেশ্বর দেবাদিদেব শিবশম্ভু ও মা জগদম্বার অসীম কৃপায় এই কদিনে তিনটে কেদার দর্শন সেরে প্রস্তুত হই চতুর্থ কেদার দর্শনের জন্য। আজ শুধু চতুর্থ কেদার অর্থাৎ শিবের মুখমণ্ডলরূপী রুদ্রনাথ ভ্রমণ প্রসঙ্গ নিয়েই আলোচনা করব। কারণ, মনে করি পঞ্চকেদারের মধ্যে রুদ্রনাথের পথটিই অধিকতম দুর্গম ও রোমাঞ্চে ভরা। গতকাল মণ্ডল চটীতে পৌঁছে প্রথমেই পথপ্রদর্শক মালবাহকের ব্যবস্থা করেন রবি কর্মকার (কুণ্ডু স্পেশালের ম্যানেজার)। কথা হয় সকাল ৭টার মধ্যে ওরা চলে আসবে। রোজকার মতো আজও পাখির কলকাকলিতে খুব ভোরে ঘুম ভাঙল। ক্ষুদিরাম বেড টী দিয়ে গেল ছটায়। বলল এবার তৈরি হয়ে নিন মালবাহকেরা এসে পড়বে এখুনি। চা পান করতে করতে ওরা এসে পড়ে। বলি একটু বসো, তোমরাও চা পান কর তারপর মালপত্র সব বাঁধাছাঁদা করো।। দশজনের বিছানাপত্র, রান্নার বাসনকোসন, চাল, ডাল, সবজি ও প্যাক লাঞ্চ ইত্যাদি চারজন মালবাহক ভাগ করে নেয়। পরে পুরী, সবজি প্রাতরাশ করে সাড়ে সাতটায় রওনা হই সতী অনসূয়া মন্দিরের উদ্দেশ্যে। আজ প্রায় ২২ কিমি পথ পাড়ি দিতে হবে।

সকালে সকলের মন মেজাজ খুব ভাল। বালখিল্য নদীর তীর ধরে আমরা এগিয়ে চলেছি নদীর আপন খেয়ালে বয়ে যাওয়ার গান শুনতে শুনতে। ঠিক এসময় জয়াদি মনের আবেগকে চেপে রাখতে না পেরে উদাত্ত কণ্ঠে গান গান ধরেন 'আমাদের যাত্রা হল শুরু' ওনার সঙ্গে আমরা সবাই গলা মেলাই। শম্ভুদা হ্যান্ডিক্যামে ছবি তোলেন। বালখিল্য নদীর পুল পার হয়ে একটু এগোলেই বাঁ দিকে পথ নির্দেশ রয়েছে দেবী অনসূয়া মন্দিরের। শোনা যায় একসময় বালখিল্য ঋষিদের বাস ছিল এখানে। নির্দেশিত পথে গ্রামের মধ্যে এগিয়ে গিয়ে দূর থেকে দেখতে পেলাম অনসূয়া দেবীর মন্দির। পথে বোল্ডার বিছানো, PWD-র কাজ চলছে। পথ ক্রমশ ঊর্দ্ধমুখী হচ্ছে। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে পথ চলতে ভালই লাগছে। ছোট্ট গ্রাম, অধিকাংশই কাঁচা বাড়ি। কিছু বাড়িতে রয়েছে স্লেট পাথরের ছাদ। পথের দুপাশে ক্ষেতে ফসল ধরেছে। কিছু ফসলে রং লেগেছে। তারা বাতাসে দোল খাচ্ছে দেখতে ভারি সুন্দর লাগছে। এভাবে কিছুটা পথ চলার পর দেখি বাঁ দিকের পাহাড়টা যেন বালখিল্য নদীর বুক থেকে খাড়া উঠে গেছে উপর পানে। দূর থেকে হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন কোনো প্রাচীন দুর্গের প্রাচীর। প্রকৃতির আপন খেয়ালে সৃষ্টি পাহাড়, নদীর সমন্বয়ে গড়া প্রাকৃতিক রাজ্যের অপরূপ রূপ দেখি অপলক নয়নে।

অনসূয়া দেবীর মন্দিরের কিছু আগে রয়েছে সিদ্ধিদাতা গণেশজীর একটি মূর্তি। সতী অনসূয়া ভক্তরা গণেশজীর পুজো দিলে তবেই ছাড়পত্র পাবেন মায়ের মন্দিরে প্রবেশের। একটা বড় পাথরকে কুঁদে কুঁদে গণেশজীর মূর্তিটিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মূর্তিটির বিশেষত্ব হল গণেশজীর বিশাল ভুঁড়ি। বিশাল ভুঁড়ি নিয়ে বসে থাকার অপূর্ব ভঙ্গিটিকে ভাস্কর নিপুণ হাতে ফুটিয়ে তুলেছেন। বিঘ্ননাশক গণেশজীর শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দেবার পর এগিয়ে গেলাম অনসূয়া মন্দির উদ্দেশ্যে। গাছপালার ফাঁক দূর থেকে দেখা যাচ্ছে মন্দির। দ্রুত পা চালিয়ে দশটা নাগাদ পৌঁছে গেলাম ৬,৬০০ ফুট উচ্চে সাইপ্রাস গাছের নীচে ঋষি দুর্বাসার মাতা অনসূয়া অর্থাৎ অত্রিমুনির পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রীর মন্দিরে। সামান্য বিশ্রাম নিয়ে দেবী দর্শন, পুজো-পাঠ ও প্রার্থনা করি রুদ্রনাথ যাত্রার সাফল্য কামনা করে। লাল চেলিতে আচ্ছাদিত দেবীর মুখমণ্ডলই কেবল এখানে দেখা যায়। মায়ের মাথায় রুপোর মুকুট, নাকে সোনার নথ। ফি বছরে দূরদূরান্ত থেকে বহু যাত্রী আসেন মায়ের কাছে সন্তান কামনায়। পুরোহিত সতী অনসূয়া কাহিনী প্রসঙ্গে বলেন— 'দেবর্ষি নারদ স্বর্গে তাঁর নিজস্ব বাচনভঙ্গীতে লক্ষ্মী, পার্বতী ও সরস্বতীর নিকট মর্ত্যের মানবী অনসূয়ার পতিব্রতার কাহিনী শোনান। কাহিনী শোনার পর তিন দেবীর কৌতূহল জাগে, এবং ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁদের স্বামীদের অনুরোধ করেন তোমরা মর্ত্যে গিয়ে অনসূয়ার পতিব্রতার পরীক্ষা নিয়ে এসো। পত্নীদের অনুরোধে বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ব্রহ্মা মানবরূপী সাধু বেশে অনসূয়ার কুটীরে উপস্থিত হয়ে মুনিবরের অনুপস্থিতির সুযোগে ভিক্ষা মাগেন। অনসূয়া সাধুদের ভিক্ষা দিতে এলে তাঁরা বলেন এভাবে আমরা ভিক্ষা গ্রহণ করি না। তোমাকে বিবস্ত্র হয়ে ভিক্ষা দিতে হবে। তবেই তা আমরা গ্রহণ করব। এ ধরনের অদ্ভুত প্রস্তাব শুনে অনসূয়া হতভম্ব হয়ে ভাবতে থাকেন এবং খানিক পর তিনি যোগবলে জানতে পারেন এই ছদ্মবেশী সাধুদের প্রকৃত পরিচয়। তখন তিনি তাঁর যৌগিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে তিন ভিক্ষুক সাধুকে ছয় মাসের শিশুতে পরিণত করেন এবং বিবস্ত্র হয়ে মাতৃস্নেহে তাঁদের খাওয়াতে থাকেন। এভাবে বেশ কিছুকাল অতিবাহিত হয়। এদিকে স্বর্গের তিন

দেবী তাঁদের স্বামীর প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় থেকে যখন দেখেন তাঁরা ফিরছেন না তখন তাঁরা বাধ্য হয়ে অনসূয়ার পর্ণকুটীরে হাজির হয়ে দেখেন তিন দেবশিশু আপন মনে খেলা করছেন আর অনসূয়া মাতৃস্নেহে তাঁদের দেখভাল করছেন। এহেন অবস্থায় দেবীরা সমবেতভাবে তাঁদের শিশু স্বামীদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেবার জন্য অনসূয়াকে অনুরোধ করেন। এবং অনসূয়া পতিব্রতাকে সম্মান জানিয়ে আশীর্বাদ করেন।' সুন্দর কাহিনীটি শোনানোর পর পুরোহিত বলেন অতিমুনির সাধনক্ষেত্র দেখতে হলে জঙ্গলের পথে ২ কিমি গিয়ে অত্রিপাহাড়ের গুহায় যেতে হবে। মালবাহকদের সাথে পরামর্শ করে ঠিক করি অত্রিপাহাড়ে পথে না গিয়ে আমরা রোমাঞ্চে ভরা চতুর্থ কেদার রুদ্রনাথের পথ ধরব। (ক্রমশ)

একটি কপোল-কল্পিত সংলাপ

বসু রায়চৌধুরী

বসু।। আরে রায়চৌধুরীদা, বঙ্গবিভীষন হওয়ার জন্য অনেক ভালোবাসা, শ্রদ্ধা—

রায়চৌধুরী।। তোর দেখি কাক-কাঁকুড় জ্ঞান নেই। বঙ্গবিভীষন নয় রে গাধা, ওটা বঙ্গবিভূষণ।

বসু।। দাদা! এখন এই বঙ্গে যারা বিভীষণ তারাই বিভূষণ!

রায়চৌধুরী।। কি বলছিস! আমরা হচ্ছি সমাজের অভিভাবক। অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সজাগ প্রহরী।

বসু।। তবে গত কয়েকদিন ধরে রসগোল্লাখালিতে যে নারী নিগ্রহ, গরিবের উপর চরম অত্যাচার, চাষের জমি কেড়ে নেওয়া ইত্যাদিতে বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত, কই তুমি বা তোমার বন্ধুরা তো কিছু বলছো না!

রায়চৌধুরী।। এসব তো প্রচার! আগে প্রমাণ হোক।

বসু।। তবে ১২ বছর আগে রবীন্দ্র সদনে মিটিং করে তোমরা কেন বলেছিলে, তখনকার মুখ্যমন্ত্রী শাক্যদেবের সাদা পাঞ্জাবি রক্তে লাল হয়ে গেছে!

রায়চৌধুরী।। ভৃঙ্গীগ্রামে ওঁর পুলিশ গরিব গ্রামবাসীদের খুন করেছিল তাই!

বসু।। কিন্তু দাদা সেটাও তো প্রমাণিত হয়নি। এমনকি ১২ বছরেও কোনো কমিশন, কোনো গোয়েন্দা সেটা প্রমাণ করতে পারেনি। উপরন্তু সেদিনকার পুলিশ অফিসাররা এখন মন্ত্রী! আচ্ছা দাদা এই যে স্কুল কলেজের চাকরি সব লাখ লাখ টাকায় বিক্রি হয়ে গেল— তোমাদের তো কোনো বিবৃতি নেই!

রায়চৌধুরী।। আহা, ও তো বিচারাধীন!

বসু।। তাই তো! একটা অপ্রমাণিত, আর একটা বিচারাধীন। ভাবের ঘরে চুরি করে কতদিন চলবে! এটা না হয় রাজ্যের ব্যাপার। কিন্তু দিল্লীশ্বর লোদী সাহেবের বিভিন্ন সময়ে নানা সংস্কৃতিক ফতোয়া বা অগণতান্ত্রিক হুকুমের বিরুদ্ধেও তো তোমরা নিশ্চুপ!

রায়চৌধুরী।। চুপ করে নেই। অপেক্ষা করছি, প্রতিবাদ করার এক নিরাপদ সময়ের জন্য।

বসু।। (অট্টহাসি) সে সময় আর আসবে না। ওই যে তোমার বন্ধু, আগুন খেকো বিপ্লবী নাট্য পরিচালক, ভৌতিক সেন, কেমন সুরসুর করে, 'জন ভারত রঙ্গ মহোৎসব'য়ে লোদীর প্রশস্তিকারক প্রচারমূলক নাটক মঞ্চস্থ করলেন।

রায়চৌধুরী।। বাঃ, সে তো বাধ্য হয়ে।

বসু।। না হলে যে বাৎসরিক অনুদানটি বন্ধ হয়ে যাবে। সম্প্রতি সাবিত্রী বাই ফুলে পুনে ইউনিভার্সিটির অধীনে ললিত কলা কেন্দ্র-র একজন অধ্যাপক ও পাঁচজন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয় কেন জানো?

রায়চৌধুরী।। ওই তো, ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করার জন্য।

বসু।। তাদের অপরাধ ছিল, নাট্যবিষয়ক একটা পরীক্ষায় রামলীলার ওপর ভিত্তি করে প্রহসন মূলক নাট্যনির্মাণ। একবার ভাবো, এ যুগে জন্মালে, 'মেঘনাদ বধ কাব্য'-র জন্য মাইকেলের ১০ বার ফাঁসি এবং আজীবন কারাবাসের হুকুম হতো!

রায়চৌধুরী।। বুঝি রে সব বুঝি! মাঠে ময়দানে লড়াই তো আর করতে পারি না, আমরা যে বুদ্ধিজীবী!

বসু।। না, বুদ্ধিজীবী নও। তোমরা বৃত্তিজীবী! স্বপ্রতারক - নিশ্চুপ বুদ্ধিজীবী! সেই প্রকৃত বুদ্ধিজীবী যে প্রতি নিয়ত জনগণের অধিকারকে সমর্থন করবেন। To question or not to question? That is the question। এটাই বুদ্ধিজীবীর প্রথম এবং একমাত্র লক্ষণ।

রায়চৌধুরী।। খুব ভালো বলেছিস।

বসু।। এটা আমার কথা নয়, ইতিহাসবিদ রোমিলা থাপার কথা। ভাবো, রায়চৌধুরীদা ভাবা প্র্যাকটিস করো।

বেথুন ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

প্রতিবেদক— গৌতম রায়চৌধুরী

গত বছরের ন্যায় এবারও আমরা একটু অন্যভাবে দিনটি পালন করি। একুশে ফেব্রুয়ারি, বুধবার, এলাকার দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠোপকরণ বিতরণের দ্বারা সামান্য সাহায্য করার চেষ্টা করেছি। প্রয়াত সহ-সভাপতি রামরমণ ভট্টাচার্যের দেওয়া তহবিল ছাড়া আরও অনেকেই আমাদের আর্থিক সাহায্য করেছেন। আমরা শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর হাতে স্কুল ব্যাগ, জলের বোতাল, পেন-পেন্সিল ইরেজারসহ পেন্সিল বক্স তুলে দিয়েছি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোবিন্দপুরের বাণীসদন প্রাথমিক বিদ্যালয়, দাসনগর বিদ্যামন্দির, বড়োদা সুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ যথাক্রমে ৩৯, ২২ ও ২৬ জন ছাত্র-ছাত্রী। এছাড়া উপস্থিত ছিল যাদবপুর বয়েজ স্কুল, কাটজুনগর স্বর্ণময়ী বিদ্যাপীঠ, যোধপুর পার্ক বয়েজ স্কুল, যোধপুর পার্ক গার্লস স্কুল, কালিধন ইনস্টিটিউশন ও রামমোহন মিশন স্কুলের যথাক্রমে ০১, ০৮, ০১, ০১, ০৬ এবং ০১ জন ছাত্র। উপস্থিত শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পাঠসামগ্রী তুলে দেন সংস্থার সভাপতি পেলব মুখার্জি,

সহ-সভাপতি অশোক ধর এবং কবি অমল ধর। বাণী সদন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহেন্দ্র সিং এবং দাস নগর বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষিকা পারমিতা সাহা আমাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে এই পাঠসামগ্রী তাদের স্কুলের দুঃস্থ শিশুদের প্রভূত উপকার করবে।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন সংস্থার সম্পাদক গৌতম রায়চৌধুরী। এই বিষয়ে আরও বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট কবি অমল কর এবং সাংবাদিক গাজী মহম্মদ আবুবকর।

স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন ভবানী শংকর চক্রবর্তী এবং ঝুমা সরকার। অনুষ্ঠানে আবৃত্তি পরিবেশন করেন রমা প্রসন্ন দত্ত এবং সচ্চিদানন্দ চৌধুরী।

উপস্থিতি সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সম্পাদক অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ শুক্রবার অনুষ্ঠিত পিকনিক

প্রতিবেদক : স্নেহাংশু চাকদার

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, শুক্রবার সংস্থার পক্ষ থেকে পিকনিকের আয়োজন করা হয়। বালি থানার সন্নিকটে বাদামতলায় গঙ্গার ধারে এক দ্বিতল বাড়িতে পিকনিক অনুষ্ঠিত হয়। বাড়িটির নাম 'মণিকাঞ্চন'। গঙ্গার ঘাট সংলগ্ন, বাগানসহ এক অপূর্ব বাড়ি।

সংস্থার সদস্য, শুভানুধ্যায়ী, বাসের স্টাফসহ মোট ৫৬ জন পিকনিকে অংশ গ্রহণ করেন। তার মধ্যে ২/৩ ভাগ মহিলা, ৭৫ উর্দ্ধ ২০ জন এবং ৭ জন ছোট বাচ্চাও অংশ গ্রহণ করেছেন। অনেকেই শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও পিকনিকে অংশ গ্রহণ করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিলেন।

সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে বেথুন ইন্সটিটিউটের সম্মুখ থেকে ১টি বাস ছাড়া হয়, ১১ টায় তা গন্তব্য স্থানে পৌঁছায়। বাসের ভিতরেই টিফিনের ব্যবস্থা করা হয়। অংশগ্রহণকারী সদস্যগণ স্বরচিত কবিতা, আবৃত্তি, সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

অংশগ্রহণকারী সদস্যদের নিকট থেকে মোট ২৩৫০০/- টাকা সংগ্রহ করা হয়। তাছাড়া সংস্থার পক্ষ থেকে প্রতিবারের মতো এবারও ৫০০০/- টাকা অনুদান দেওয়া হয়। বাসের ব্যবস্থা করেন আমাদের সদস্য নারায়ণ দাস। যাতায়াতের ব্যবস্থাসহ পিকনিকের দায়িত্ব পালন করেন স্নেহাংশু চাকদার, নারায়ণ ঘোষ, উমা সাহা। এখানে একটি কথা উল্লেখ না করলেই নয় যার সাহায্য ছাড়া এমন সুন্দর বাড়িটি পাওয়া সম্ভব হত না, তাঁর নাম সুকান্ত চ্যাটার্জী। তিনি আকুপাংচার সেন্টারের জন্মলগ্ন থেকে সুলভ মূল্যে সূঁচ (নীড্‌ল্) সাপ্লাই করে আসছেন।

সমস্ত অনুষ্ঠানটি খুব উপভোগ্য হয়। সুষ্ঠ আয়োজনের জন্য উপস্থিত সবাই সংস্থার প্রশংসা করেন।

Published by Goutam Roychowdhury on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Monalisa Printers, D/26 Katjunagar, Kolkata - 700 032 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Goutam Roychowdhury.
E-mail- bethune geriatrics@gmail.com. Website : bethunegeriatric.in